বই পরিকল্পনায় : গ্রন্থিক প্রকাশন
মুদ্রণ : গ্রন্থিক মিডিয়া (প্রিন্টিং প্যাকেজার)

শ্বাস নেওয়ার লড়াই

রাষ্ট্র, স্বাধীনতা ও নাগরিক অধিকার

সহুল আহমদ

ঐতিহ্যের সাথে সমকালের বন্ধন
গ্রন্থিক
প্রকাশন

মা, ধোঁয়া, দম নিতে পারছি না।
১৪ বছরের ফারজানা, রূপগঞ্জে হাসেম ফুডসের কারখানার অগ্নিকাণ্ডে নিহত

আমি শ্বাস নিতে পারছি না।
মার্কিন নাগরিক জর্জ ফ্লয়েড, পুলিশি নির্যাতনে মৃত্যুর আগ মুহূর্তে

We revolt simply because, for many reasons, we can no longer breathe.
Frantz Fanon

ভূমিকা

‘শ্বাস নেওয়ার লড়াই’- ভিন্ন স্থান ও কালে এই বাক্যাংশকে হয়তোবা রূপক অর্থে পাঠ করা যায়, কিন্তু আমরা যে কালে বাংলাদেশ রাষ্ট্রে নাগরিক হিসেবে জীবন যাপন করছি, সেখানে এটা রূপক অর্থের পরিবর্তে আক্ষরিক অর্থে আমাদের সামনে হাজির হয়। কোভিড অতিমারি বাংলাদেশ সহ পৃথিবীর অধিকাংশ রাষ্ট্রে যে ‘অক্সিজেন’ সঙ্কট সামনে নিয়ে এসেছিল, সেটা যেমন ‘শ্বাস নেওয়ার লড়াই’ কে আক্ষরিক অর্থে পড়তে বা বুঝতে প্রলুব্ধ করে, তেমনই বাংলাদেশ রাষ্ট্রে বিরামহীন গুম-খুন-ক্রসফায়ারের বাস্তবতা একইভাবে প্রলুব্ধ করে। অতিমারি আর কিছু না হোক, বাংলাদেশ রাষ্ট্রকে একেবারে মুখোশহীন করে দিয়েছে, এবং খোলা চোখে বাংলাদেশ রাষ্ট্রকে দেখার সুযোগ তৈরি করে দিয়েছে। সে সুযোগে লিখিত কলাম-ধরনের প্রবন্ধ/নিবন্ধের সঙ্কলন হচ্ছে এই গ্রন্থ; বিভিন্ন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে লেখা হয়েছিল। যে পরিস্থিতিতে সেগুলো লেখা হয়েছিল, তা নিয়ে গোড়াতে দুয়েকটা মন্তব্য পেশ করতে চাই।

বাংলাদেশের বিরাট সংখ্যক জনগোষ্ঠী প্রবাসে বসবাস করেন এবং রেমিটেন্স পাঠানোর মাধ্যমে দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ইউরোপের যে দেশ প্রথম করোনা মহামারির এপিসেন্টার হিসেবে ঘোষিত হয়েছিল সেই দেশেও প্রায় লক্ষাধিক বাংলাদেশি প্রবাসী রয়েছেন। করোনা মোকাবিলায় প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে ইতালি ফেরৎ প্রবাসীদের জন্য (হোম-) কোয়ারেন্টিনের সিদ্ধান্ত ও ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। প্রবাসীদের হাতে সিল মেরে বলে দেয়া হবে যে, তারা যেন ১৪ দিন ঘরে সঙ্গ-নিরোধ অবস্থায় থাকেন। কিন্তু, দেখা গেল অধিকাংশই এই হোম-কোয়ারেন্টিন মানছেন না, এবং যত্রতত্র ঘুরে বেড়াচ্ছেন। সাংবাদিকরা এ নিয়ে প্রচুর সংবাদ করেছেন। সব দোষ গিয়ে পড়ে প্রবাসীদের ঘাড়ে। কিন্তু কেউ বাংলাদেশে এই হোম-কোয়ারেন্টিনের সিদ্ধান্তের কার্যকারীতার মাত্রা নিয়ে কোনো প্রশ্ন তুললেন না। নিঃসন্দেহে ইউরোপের অনেক দেশ হোম-কোয়ারেন্টিনের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল, এবং করোনা মোকাবেলায় এটাকে খুব জরুরি পদক্ষেপ হিসেবে ধরা হয়। কিন্তু, বাংলাদেশে যারা হোম-কোয়ারেন্টিনের ফরমান জারি করেছিলেন তারা বোধহয় দেশকে ইউরোপ বলে ঠাহর করেছিলেন। প্রথমত বাংলাদেশের প্রবাসীদের একটা বড় অংশই গ্রামে বসবাস করেন, যৌথ পারিবারিক কাঠামোই সেখানে প্রধান। আমাদের যাদের যৌথ-পরিবারের বসবাস করার অভিজ্ঞতা রয়েছে তারা

জানি সেখানে ১৪ দিনের মতো এক কক্ষে সঙ্গিহীন অবস্থায় থাকা কেবল অকল্পনীয় নয়, অসম্ভবও বটে। সেখানে একজন প্রবাসী এলে ১৪ দিন কীভাবে তার জন্য কোয়ারেন্টিনের ব্যবস্থা করা যাবে? আবার, সেই প্রবাসী যিনি কিনা দেশে মা-বাবা-ভাই-বোনদের উন্নতির জন্য প্রবাসে প্রায়-দাস জিন্দেগী কাটান, তিনি কীভাবে দেশে ফিরে তার স্বজনদের থেকে দূরে থাকবেন? আমাদের নীতি-নির্ধারকরা বাংলাদেশকে ইতালি বা ইউরোপের কোনো দেশ সমঝেছিলেন যে, তারা বলবেন আর মানুষ দৌড়ে দৌড়ে কোয়ারেন্টিনে চলে যাবে। এই সিদ্ধান্ত নেয়া থেকেই বোঝা যায় তাদের কোনো ধারণাই নেই বাংলাদেশের সমাজ কীভাবে ‘ফাংশন’ করে।[১] গ্রামের যৌথ-পারিবারিক জীবন যাপনের কথা বাদই দিলাম, যে ঢাকা শহরে প্রতি বর্গ কিলোমিটারে প্রায় ২৩ হাজারের বেশি মানুষ বসবাস করেন, সেই শহরে কীভাবে শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখা যেতে পারে তা নিয়েও তাদের সিদ্ধান্তমালাতে কোনো আলামত নেই। তবে হোম কোয়ারেন্টিন না দিয়ে বাধ্যতামূলক কোয়ারেন্টিনের জন্য মার্চের মাঝামাঝি ইতালি ফেরত ১৪২ জন প্রবাসীকে ঢাকার আশকোনো৷ হজ্জ্ব ক্যাম্পে আনা হয়। সেখানকার পরিবেশ ও পরিস্থিতি থাকার অনুপযোগী হওয়াতে এই প্রবাসীগন সেখানে থাকতে অপারগতা জানান। কয়েকজন ব্যবস্থাপনার ত্রুটিও তুলে ধরেন, তারা এত লম্বা সময় ধরে জার্নি করে এসেছেন, অথচ কোনো খাবার-দাবার নেই। সাথে বাচ্চা-কাচ্চা রয়েছে তাদেরকে খাবার দিতে পারছেন না, স্থান অপরিষ্কার, ডাক্তার বা কারও পক্ষ থেকে কোনো ব্রিফিং করা হচ্ছে না। একজন বলেন যে, কোয়ারেন্টিনে থাকতে কোনো সমস্যা নেই, কিন্তু পরিবেশটা তো থাকার মতো হতে হবে। সেখানে একজন প্রবাসী মেজাজ হারিয়ে ‘ফাক দ্যা কান্ট্রি সিস্টেম’ বলে চিৎকার চ্যাঁচামেচি করতে থাকেন। এই ঘটনা বাংলাদেশের যাবতীয় খোলা ময়দানে এক ব্যাপক আলোচনার বিষয়ে পরিণত হয়। এমনিতেই প্রবাসীরা হোম কোয়ারেন্টিন যথাযথভাবে না মানার কারণে আমাদের ভীত-সন্ত্রস্ত শহুরে মধ্যবিত্তশ্রেণি তাদেরকে শত্রুতে পরিণত করেছিল, আর এই ‘ফাক দ্যা কান্ট্রি সিস্টেম’ শোনার পর প্রবাসীদের বিরুদ্ধে গালাগালির মাত্রাও বেড়ে যায় কয়েকগুণ। এমনকি আমাদের মন্ত্রীও প্রবাসীদের ব্যাঙ্গ করে ‘নবাবজাদা’ বলে সম্বোধন করেন। এবং একসময় পুরো আলোচনা দেশপ্রেমের জমিনে এসে ঠেকে। বলা হলো, এই প্রবাসীদের মধ্যে কোনো দেশপ্রেম নাই, তারা নিজেরা মরার জন্য এবং দেশের সবাইকে মারার জন্য দেশে আসছে। সব দোষ পড়ে প্রবাসীদের ঘাড়ে।

রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনার ত্রুটি কীভাবে জনগণের একাংশের উপর চাপিয়ে দেয়া যায়, এবং জনগণেরই এক অংশকে আরেক অংশের মুখোমুখি করিয়ে দিয়ে ক্রমাগত বিদ্বেষ-চর্চায় নিয়োজিত রাখা যায় তার একটা নমুনা হিসেবে প্রবাসী বিষয়ক উপরোক্ত ঘটনাকে পেশ করা হলো। প্রথমে এমন সিদ্ধান্ত নেয়া হলো যার বাস্তবায়ন অসম্ভব,

---

১. এই ধরনের একটি আগ্রহোদ্দীপক আলোচনা দেখতে পারেন : শাহাদুজ্জামান, সুমন রহমান ও ইমরান মতিন, ‘তথ্য ও বার্তাবিভ্রাটে করোনা মহামারি’, *প্রথম আলো*, ২০২০

দ্বিতীয়ত এমন সিদ্ধান্ত নেয়া হলো যেখানে ব্যবস্থাপনাগত ত্রুটির মাত্রা ভয়াবহ, অথচ বলির পাঠা বানানো হলো জনগণের একাংশকে, যেন প্রবাসীদের অসচেতনতা এবং দেশপ্রেমহীনতাই করোনা বিস্তারের কারণ। এমন অবস্থায় যেখানে জনগণকে 'অবাধ্য', 'অশিক্ষিত' 'অসচেতন' হিসেবে উপস্থাপন করা সম্ভব হয়েছে, সেখানে ভীত-সন্ত্রস্ত মধ্যবিত্তের তরফ থেকে বারেবারে এই 'অশিক্ষিত' ও 'অসেচতন' জনগণকে 'ডান্ডা দিয়ে ঠান্ডা করা'র জন্য জোরদার ফরমায়েশ আসতে শুরু করে। দেখা গেল পুলিশ বা আইন শৃঙ্খলা বাহিনী জনগণের ওপর, বিশেষ করে দরিদ্র জনগণের উপর একধরনের সহিংস ও অপমানজনক পদক্ষেপ নেয়া শুরু করল। এর পক্ষে জনসম্মতি আগে থেকেই উৎপাদন করা শুরু হয়েছিল। আমরা দেখতে পেলাম, রিকশা চালক কেন ঘর থেকে বের হয়েছে এই অজুহাতে পুলিশ কান ধরে উঠবস করাচ্ছে, আমলারা বিভিন্ন স্থানে ক্ষমতার ব্যবহারে উদগ্রীব হয়ে উঠছেন। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের অনেক বুদ্ধিজীবী ও সম্মতি উৎপাদনকারীরা সেনাবাহিনীকে 'দেখামাত্রই গুলি'র হুকুম দেওয়ার আর্জি জানান। জনগণের ওপর সহিংস ক্ষমতা প্রয়োগ করার জন্য যারা ওঠে পড়ে লাগলেন এবং জনগণকে ডিহিউম্যানাইজ করা শুরু করলেন তাদের মধ্যে দুটো বৈশিষ্ট্য খুঁজে পাওয়া যায়। এক, তারা করোনার ভয়ে চরম আতঙ্কিত, এবং ইতিমধ্যেই প্রকাশিত দেশের স্বাস্থ্যব্যবস্থার ভঙ্গুর দশা তাদের আতঙ্ককে বাড়িয়ে দেয়। শ্রেণি অবস্থানের কারণেই ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্রের সমালোচনা করার চেয়ে 'অসচেতন' ও 'অশিক্ষিত' জনগণকে গালিগালাজ করা ও দমন করা সহজ। দুই, তারা জনগণের অসচেতনতাকে লক্ষ্য করতে গিয়ে শাসকগোষ্ঠী তথা রাষ্ট্রের চরম গাফিলতি বিষয়ে নীরবতার পথ অবলম্বন করেন। করোনা শনাক্ত হওয়ার পরও সরকার 'মুজিব বর্ষ' পালন থেকে বিরত থাকেনি, বিভিন্ন স্থানে মহাসমারোহে নির্বাচনও অনুষ্ঠিত হয়েছে। রাষ্ট্র নিজেই সচেতন না, উল্টো সে ক্রমাগত জনগণের মধ্যে সচেতনার সবক দিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু, এই নির্বাচন অনুষ্ঠান, মুজিব বর্ষ উদযাপন, এবং স্বাস্থ্য ব্যবস্থার এমন উদাম অবস্থার প্রকাশ সবকিছুর তলে যে বিষয়টা স্পষ্ট হয়েছিল তা হচ্ছে, এই রাষ্ট্র এখনও তার জনগণকে নিজের বলে মনে করে না, তার গৃহীত পদক্ষেপগুলোর উদ্দেশ্য থাকে মূলত শাসকগোষ্ঠীকে ঘিরে (শাসকগোষ্ঠীর শ্রেণি ঘিরেই)। তার সিদ্ধান্তের কেন্দ্রে কখনো আপামর জনগণ থাকে না, বরঞ্চ থাকে কেবল শাসকশ্রেণি। একটা দেশের শাসকগোষ্ঠী জানেনেই না, রাজধানীর অদূরে শিল্পনগরী নারায়ণগঞ্জে কোনো আইসিইউ ব্যবস্থা নেই, এবং শুনে অবাক হয়ে যান। এটা বলা হচ্ছে স্বাধীনতার প্রায় অর্ধ-শতক পরে, এবং রাজধানীর একেবারে পাশের অঞ্চল সম্পর্কে; রংপুর-কুড়িগ্রামের কথা না হয় বাদই দিলাম। করোনা কেবল অনেকদিনের মুখোশ সরিয়ে ফেলেছে। চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছে, গত পঞ্চাশ বছর যাবৎ এই রাষ্ট্র যে ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে তা কতটা শ্রেণি-কেন্দ্রিক, কতটা রাজধানী-কেন্দ্রিক। একদিকে রাষ্ট্র বা সরকারি দল দাবি করছে হুহু করে জিডিপির বৃদ্ধি হচ্ছে, রাস্তা-কালভার্ট-সেতু-

ফ্লাইওভার তৈরি হচ্ছে, অন্যদিক সেই রাষ্ট্র বা সরকারই ডাক্তার ও স্বাস্থ্যকর্মীদের চিকিৎসাসেবা দেয়ার ন্যূনতম সরঞ্জামের যোগান দিতে পারছে না, আবিষ্কার করছে অধিকাংশ জায়গায় আইসিইউ নেই, ভেন্টিলেটর নেই। অথচ, এই মুখোশ কিন্তু করোনার মহামারিরূপ ধরার পর উন্মোচিত হয়নি, কেবল করোনা সংক্রমিত হওয়া মাত্রই উন্নয়নের বাগাড়ম্বর ঝরে গিয়েছে। উন্নয়ন যে হয়েছে তা সত্য, এবং তা প্রচণ্ড শ্রেণি-কেন্দ্রিক উন্নয়ন তাও সত্য। কিন্তু অতিমারিতে সম্ভাব্য ভয় থেকে মধ্যবিত্তের একাংশ বর্ণবাদী ও কর্তৃত্বপরায়ন মনোভঙ্গি প্রকাশ করছিল – এটা যেমন সত্য, তেমন সত্য হচ্ছে অতিমারির ধাক্কা খুব জোরেশোরে লেগেছিল মধ্যবিত্তের ওপর। বিদ্যমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থাতে মধ্যবিত্তের ‘বায়বীয়’ হাল লকডাউনের সময় শহর ছাড়ার ধুম দেখে ঠাহর করা যায়। অতিমারির নানাবিধ ঘাত-প্রতিঘাত নিম্নবিত্ত, নিম্ন-মধ্যবিত্ত ও মধ্যবিত্ত সকলের ওপর পড়েছিল। তবে রাষ্ট্রের যে চেহারা তখন উন্মোচিত হয়েছে সেটা থেকে পরিষ্কার এই রাষ্ট্র ঘোর বিপদে উপর্যুক্ত কোনো শ্রেণিকেই ধারণ করতে পারছে না, তার যাবতীয় মনোযোগ কেবল ‘ভিআইপি’ নামক এক শ্রেণির জন্য। তাদের সুষ্ঠু এস্তেমালের জন্য হররোজ আমাদেরকে যেমন সড়ক ছেড়ে দিতে হয়, তেমনই অতিমারিতে তাদের জন্য বরাদ্দ ছিল ‘ভিআইপি’ চিকিৎসা।[২] ভুলে গেলে চলবে না, এই ‘ভিআইপি’ গোত্র রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার খুব ঘনিষ্ঠ, লুটেরা ও পাচারকারীদের নিয়ে গঠিত হয়েছে।

যে, কোনো দুর্যোগ পরিস্থিতিকে কর্তৃত্ববাদী সরকার নানাভাবে কাজে লাগায়। যেমন, বিদ্যমান আওয়ামী শাসনামল কোভিড অতিমারিকে ব্যবহার করেছে মোটাদাগে দুইভাবে। প্রথমত, বাংলাদেশের যে- কোনো দুর্যোগের বেলায় ‘সমাজ’ প্রচণ্ড সক্রিয় হয়ে ওঠে। আমাদের ‘রাষ্ট্র’ দমনমূলক দিক থেকে শক্তিশালী হলেও গভর্নমেন্টালিটির দিক থেকে অত্যন্ত দুর্বল। যে- কোনো দুর্যোগের প্রাথমিক অবস্থাতেই তার সকল নাটবল্টু খুলে খুলে পড়ে যায়। ফলে, কেবল রাষ্ট্রের মুখাপেক্ষী না হয়ে সমাজ নানাভাবে দুর্যোগ মোকাবিলার কসরৎ করে এবং ক্ষয়ক্ষতিকেও কিছুটা সামাল দিয়ে দেয়। কিন্তু সফল হওয়ার পর সরকারিপক্ষ ‘সমাজে’র এই সক্রিয়তাকে খারিজ করে সেটাকে নিজেদের ‘সফলতা’ হিসেবে হাজির করে। লকডাউনে যখন ঢাকা শহরের শ্রমজীবী, দরিদ্র, রিকশাচালক ও সড়কে রাত কাটানো মানুষদের আয়-রোজগার

---

২. করোনাকালে ভিআইপিদের জন্য আলাদা চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। নিজেদের সিদ্ধান্তের পক্ষে যুক্তি দিয়ে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব হাবিবুর রহমান বলেছেন, “ভালো সচ্ছল পেশেন্ট আছে না? কথা ওঠেছিল তারা কোথায় ভর্তি হতে পারে? সরকারিভাবে আমরা যা করছি, সেগুলো তো আপামর জনগণের জন্য। যে শতশত মানুষ অসুস্থ হচ্ছে, তাদের জন্যে তো একটা ব্যবস্থা আছেই।” ধরুন একজন প্রখ্যাত শিল্পপতি, উনি হয়তো করোনার চিকিৎসায় সরকারি যে ব্যবস্থাপনাগুলো আছে - এগুলোতো সাধারণ মানের - সেখানে যেতে উনি ইতস্তত করলেন। তো উনি অ্যাপোলো (বর্তমানে এভারকেয়ার হাসপাতাল), ইউনাইটেড বা স্কয়ারে গেলে যেন চিকিৎসা পায়। তারা টাকা দিয়েই চিকিৎসা করাবেন।” “করোনাভাইরাস: ‘ভিআইপিদের’ চিকিৎসায় আলাদা হাসপাতাল নিয়ে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় দিয়েছে যুক্তি, অস্বীকার করছে তথ্য মন্ত্রণালয়”, *বিবিসি বাংলা*, ২৩ এপ্রিল ২০২০

বন্ধ হয়ে গেল, তখন সমাজের নানা সংগঠন সেই ভয়াবহ পরিস্থিতি মোকাবিলায় নানাভাবে এগিয়ে এল। লকডাউনের কারণে নিম্নশ্রেণির মানুষদের জীবনে যে ভয়াবহ পরিস্থিতি হাজির হয়েছিল সেটা আরও করুণ অবস্থাতে না যাওয়ার পিছনে 'সমাজ'-এর সক্রিয়তা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। কিন্তু, পরিশেষে বিদ্যমান রেজিম এটাকে নিজেদের 'সফলতা' বলেই দাবি করে এবং এই সফলতা তাঁদের স্বৈরতন্ত্র জায়েজীকরণের উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হয়। দ্বিতীয়ত, দুর্যোগকালে যে কোনো কর্তৃত্ববাদী সরকার 'দুর্যোগ মোকাবিলা'র অজুহাতে 'বৈধ'ভাবে আরও বেশি কর্তৃত্বপরায়ন হয়ে ওঠার মওকা পেয়ে যায়। কোভিড অতিমারির কালে বিদ্যমান শাসনামল এক ভয়াবহ দমনমূলক রূপ হাজির করে। মহামারি পরিস্থিতিতে যারা বিভিন্ন সরকারি সিদ্ধান্তের সমালোচনা করছিলেন তাঁদের ওপর নেমে এসেছিল আইনি নিপীড়ন। এমনকি, প্রাক্তন স্বাস্থ্যমন্ত্রীর সমালোচনাকেও 'মানহানি' হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছিল। এই নিপীড়নের প্রাদুর্ভাব রীতিমতো বিশ্ববিদ্যালয়ের আঙ্গিনাতেও নেমে এসেছিল।[৩]

অর্থাৎ, সারা দুনিয়া যেখানে করোনা মোকাবিলায় হিমশিম খাচ্ছিল, করোনার বিরুদ্ধে 'যুদ্ধ' ঘোষণা করছিল, সেখানে বাংলাদেশ রাষ্ট্র ও সরকার যেন তার জনগণের বিরুদ্ধেই অঘোষিত এক 'যুদ্ধ' ঘোষণা করেছিল। দুই উপায়ে এই 'যুদ্ধের' বাস্তবতা উৎপাদন করা হয়েছিল : একদিকে, নজিরবিহীন বিপদজনক সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও পদ্ধতিগত সিদ্ধান্তহীনতার মাধ্যমে জনগণের একটা বড় অংশের জীবনকে হুমকির মধ্যে ফেলে দেয়া; অন্যদিকে যারা এমনতর সিদ্ধান্তের সমালোচনা করছেন এবং ভুলত্রুটি ধরিয়ে দিচ্ছেন বিভিন্ন আইনি মারপ্যাঁচের মাধ্যমে তাদের নাগরিক অধিকার হরণ। তাদেরকে তুলে নিয়ে যাওয়া-দীর্ঘদিন 'নিখোঁজ' থাকার পর গ্রেফতার দেখানো-মামলা দায়ের করা সহ নানাবিধ হয়রানি ও নিপীড়ন করা হচ্ছিল। এই গ্রন্থের অধিকাংশ প্রবন্ধ আসলে এমনই এক পরিস্থিতিতে লেখা হয়েছিল। ফলে, বাক-স্বাধীনতা, ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, ক্রসফায়ার, রাষ্ট্রীয় সহিংসতা, নাগরিক আন্দোলন, গণতন্ত্রের হালচাল ইত্যাদিই গ্রন্থের মূল উপজীব্য।

দুই

এই গ্রন্থ বিদ্যমান আওয়ামী শাসনমালকে কর্তৃত্ববাদী ও ফ্যাসিবাদী হিসেবে চিহ্নিত করেছে। ফ্যাসিবাদ বিষয়ে দুটো নোক্তা দিয়ে রাখা দরকার। প্রথম নোক্তা হচ্ছে, ফ্যাসিবাদ শব্দের সাথে গত শতকের প্রথম অর্ধেকের ইউরোপীয় অভিজ্ঞতার একটা সরাসরি সম্পর্ক থাকলেও, আমরা একেবারে বাংলাদেশের নির্দিষ্ট অভিজ্ঞতা ও ইতিহাসের আলোকে বোঝার চেষ্টা করি। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে চারটি উপাদানের

---

[৩] এই বিষয়ে বিস্তর আলাপের জন্য দেখা যেতে পারে : Maren Aase, 'Disaster governance and autocratic legitimation in Bangladesh: Aiding autocratization?', In Sten Widmalm (ed.) *Routledge Handbook of Autocratization in South Asia*, Routledge, 2022

মিথস্ক্রিয়া কাজ করে : ঔপনিবেশিক আইন, সাংবিধানিক স্বৈরতন্ত্র, বাঙালি জাতীয়তাবাদ (কখনো সেটা বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদের রূপ ধারণ করে) এবং নয়া-উদারনীতিবাদ। প্রথমত, বাংলাদেশের সকল আইন-কানুন, পেনাল কোড সবকিছু গভীরভাবে ঔপনিবেশিক উত্তরাধিকার বহন করে চলছে। এখানকার আইন-কানুন যে ধারাবাহিকভাবে নাগরিকের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করে তার মূল কারণ হচ্ছে এর সাথে লেপ্টে থাকা উপনিবেশের অভিজ্ঞতা। এমনকি, ডিজিটাল মাধ্যম নিয়ন্ত্রণে যে সকল নিত্য-নতুন আইন প্রণয়ন করা হচ্ছে সেখানেও লক্ষণীয়ভাবে ঔপনিবেশিক বিভিন্ন আইনকে আবারও জ্যান্ত করে তোলা হচ্ছে। দ্বিতীয়ত, মুক্তিযুদ্ধের পরপরই বাংলাদেশে যে সংবিধান রচনা করা হয়েছিল সেটার ভেতর লুকিয়ে আছে ভয়াবহ স্বৈরতান্ত্রিক কাঠামো। যদিও, গণতন্ত্রের কথা বলা হয়েছে, কিন্তু চর্চার ক্ষেত্রে সবকিছু নজিরবিহীনভাবে একব্যক্তিকেন্দ্রিক। তৃতীয়ত, বাংলাদেশে জাতীয়তাবাদী উন্মাদনা নানাভাবে ক্রিয়াশীল। কখনো ‘হাজার বছরের’ বাঙালি জাতীয়তাবাদ, আবার কখনো ‘নব্বইভাগ মুসলমানের দেশ’ এর বাঙালি + মুসলমান = বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ। পরিস্থিতিভেদে ক্রিয়াশীল হয় ভিন্ন ভিন্ন জাতীয়তাবাদ। চতুর্থত, মানুষের ভেতর যাবতীয় সম্পর্ককে ‘প্রতিযোগিতা’র স্তরে পর্যবসিত করা, নাগরিককে স্রেফ বাজারের ‘ভোক্তা’ বানানো, বাজারে কেনা-বেচার স্বাধীনতাকেই ‘উপায়’ ও ‘উদ্দেশ্য’ হিসেবে হাজির করা, রাষ্ট্রীয় সুযোগ-সুবিধাসমূহকে সঙ্কুচিত করে বেসরকারিকরণের রাস্তা প্রশস্ত করা ইত্যাদি নয়া-উদারনীতিবাদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এটাকে গণতন্ত্রের জন্যও বিপদজনক বলেও বিদ্বৎজনেরা বলেন; মৌলিক গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলির সাথে যেমন নয়া-উদারনীতিবাদের বৈরী সম্পর্ক রয়েছে তেমনই বর্তমানের পপুলিস্ট রাজনীতির সাথেও এর সখ্যতা রয়েছে।[৪] নয়া-উদারনীতিবাদ হয়ে গিয়েছে বাংলাদেশে বর্তমানের ‘উন্নয়ন’কেন্দ্রিক শ্লোগান এবং উন্নয়ন ও গণতন্ত্রকে বিপরীতমুখী হিসেবে হাজির করার মতাদর্শিক হাতিয়ার। বাংলাদেশে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিল্পসহ নানা খাতে নয়া-উদারনীতিবাদী অর্থনীতির প্রভাব নিয়ে বহুজন কথা বলেছেন। নয়া-উদারনীতিবাদীদের ব্যবস্থাপত্রে শিক্ষাকে পণ্য হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে; বিশ্ববিদ্যালয় জ্ঞান-উৎপাদনের স্থান না হয়ে, হয়ে গিয়েছে ‘আন্তর্জাতিক বাজারে কাঁচামাল সরবরাহ’ স্থান। কোভিডের কালে গার্মেন্টস শ্রমিকদের যেভাবে টেনে-হেঁচড়ে এনে ‘উৎপাদন’ বজায় রাখা হয়েছে, সেটা আসলে নয়া-উদারনীতিবাদের এক ধ্বংসাত্মক চেহারাই বটে। নয়া-উদারনীতিবাদের

---

৪. Mohammad Tanzimuddin Khan, Mohammad Sajjadur Rahman (ed.), *Neoliberal Development In Bangladesh: People on the Margins*, UPL, 2019; Anu Muhammad, *Development Re-examined: The Construction and Consequences of Neoliberal Bangladesh* , UPL, 2021; Aldo Madariaga, “Neoliberalism Has Always Been A Threat To Democracy”, *Jacobin*, 2021; মোহাম্মদ আজম, “বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষায় ‘নব্য-উদারনীতিবাদ’ : বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের ‘কৌশলপত্র’ কেন গ্রহণযোগ্য নয়?”, *রাষ্ট্রচিন্তা ব্লগ*, ২৩ জুন ২০২০

ফসল যে 'বৈষম্য' সেটা সাম্প্রতিক বাংলাদেশে সবচেয়ে ভয়াবহভাবে পরিলক্ষিত হচ্ছে : যে হারে কোটিপতির সংখ্যা বাড়ছে, সে হারে ধনী-গরিব বৈষম্য বাড়ছে। বাংলাদেশে দুর্ভাগ্যজনকভাবে আরেকটি ঘটনা ঘটছে : বিদ্যমান বুদ্ধিবৃত্তিক ও রাজনৈতিক জনপরিসরে র‍্যাডিকেল বলে পরিচিত এমন বিদ্বৎজনের কাঁধে চড়ে নয়া-উদারনীতিবাদী রাজনীতি এখানে প্রবেশ করছে। যাই হোক, আমরা বলার চেষ্টা করছি, উপর্যুক্ত চারটি উপাদানের মিশেলেই তৈরি হচ্ছে এখানকার ফ্যাসিবাদী কাঠামো। বাংলাদেশে গণতন্ত্রের যে বেহাল দশা তার সাথে এগুলোর সম্পর্ক ওতপ্রোত।

দ্বিতীয় নোক্তা হচ্ছে, আমরা এই ফ্যাসিবাদকে 'কাঠামো'র জায়গা থেকে বুঝার পাশাপাশি রাজনৈতিক সংস্কৃতির জায়গা থেকেও বুঝতে চাচ্ছি। অর্থাৎ, কেবল সর্বাত্মক রাষ্ট্রপ্রণালির জায়গা থেকে 'ফ্যাসিবাদ'কে বোঝাচ্ছি না, বরঞ্চ একে গণ-হিস্টেরিয়া হিসেবেও চিহ্নিত করছি; এর ব্যাপ্তি একেবারে তৃণমূল পর্যন্ত। এটা এক ধরনের উন্মাদনা। যে মানুষ সারাবছর যুক্তিশীল মানুষ হিসেবে পরিচিত তিনিও স্রেফ কোনো গুজবের পাল্লায় পড়ে এমন উন্মাদনার জোয়ারে গা ভাসাতে পারেন। এ ধরনের উন্মাদনা তথা ফ্যাসিবাদ আসলে সমাবেশ বা গণজোয়ারও বটে। দুটো প্রবণতা থাকে জোয়ারের মধ্যে : একদিকে বিদ্রোহ, অন্যদিকে প্রতিপক্ষের ওপর রাষ্ট্রীয় দমন-পীড়ন চালানোর প্রকট বাসনা। এ জায়গা থেকে তেরো সালের দুটো আন্দোলন/সমাবেশ - শাহবাগ ও শাপলা- এর মধ্যে আমরা ফ্যাসিবাদী প্রবণতা দেখতে পাই। একদিকে বিদ্যমান ফ্যাসিবাদী 'কাঠামো', যাকে কেউ কেউ বলবেন অগণতান্ত্রিক, অন্যদিকে এমনতর উন্মাদনা/সমাবেশের উপস্থিতি - দুটোর মিশেলে তৈরি হচ্ছে বাংলাদেশের বর্তমানের ফ্যাসিবাদী পরিস্থিতি। সেকুলারবাদী ও সেকুলার-বিরোধী - দুই মহলই ঝুঁকেছে প্রবল 'ডানপন্থা'র দিকে। আমরা বলছি, অগণতান্ত্রিক/স্বৈরতান্ত্রিক/ফ্যাসিবাদী পরিবেশে—মানে যেখানে ন্যূনতম ভোটাধিকারও নেই – উপর্যুক্ত দুই ডানপন্থা একে অপরকে পুষ্টি যোগাচ্ছে। এই ধরনের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে ও ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্রপ্রনালি আবর্তিত হয় 'ক্ষুদে মানব'[৫] কে কেন্দ্র করে, যে কিনা একদিকে বিদ্যমান যাবতীয় ডিসকোর্স থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন মনে করে, ভয় করে স্বাধীনতায়, খুঁজে বেড়ায় ফাদার-(মাদার) ফিগার, সমর্পণ করতে চায় নিজেকে। বাংলাদেশে যে 'তৌহিদী জনতা' বা 'উন্মত্ত জনতা'র উত্থান হয়েছে – যারা কিনা গুজবের ওপর ভর করে মানুষ পুড়িয়ে/পিটিয়ে মারতে পারে - তাকে বুঝতে হবে এই পরিস্থিতির আলোকে।[৬]

---

৫. Aditya Nigam, 'Fascism, The Revolt of the 'Little Man' and Life After Capitalism', *Kafila*, 2020; সারোয়ার তুষার, 'ডানপন্থার বৈশ্বিক উত্থান : অর্জুন আপ্পাদুরাই এর তত্ত্বতালাশ ও পর্যালোচনা', *শুদ্ধস্বর*, ২০২০

৬. এই দিকগুলো বিস্তারিত ভাবে আমরা আলোচনার করেছি এই প্রবন্ধে : সহুল আহমদ ও সারোয়ার তুষার, 'সাম্প্রদায়িক-বর্ণবাদ, সহিংসতা ও সংখ্যাগুরুবাদী চৈতন্য প্রসঙ্গে', *শুদ্ধস্বর*, ২০২১

তিন

বাংলাদেশে বর্তমানে সবচেয়ে বিবাদমান পরিসর হচ্ছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমসহ ডিজিটাল গণমাধ্যম। অনলাইন পরিসরের কয়েকটি দিক রয়েছে। ফেসবুক, টুইটার, ইনস্টাগ্রাম, টিকটক ইত্যাদি জনপরিসরের এক ধরনের গণতন্ত্রায়ন ঘটিয়েছে। যেভাবে টেকনোলোজির প্রকাণ্ড বিস্তার ঘটছে, মানে মোবাইল-ইন্টারনেট-সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রবেশের সুযোগ বেড়েছে, ঠিক সেভাবেই যেন জনপরিসর অবধারিতভাবে জটিল চেহারা ধারণ করেছে। যে- কোনো বিষয়ে নিজের মত যেমন তড়িৎগতিতে প্রকাশ করা সম্ভব হচ্ছে, তেমনই যে কোনো ধরনের লেখার ওপর কোনো ধরনের 'সম্পাদনা' ছাড়াই সহমত/ভিন্নমত ব্যক্ত করা সম্ভব হচ্ছে। জনপরিসরে প্রকাশিত মতামত এখন আর 'সম্পাদিত' অবস্থায় নেই। আবেগের চূড়ান্ত তড়িৎ বিস্ফোরণ যেমন নিত্য ঘটনা, তেমনই তড়িৎ গতিতে ঘটনার পরিবর্তনও নিত্য ঘটনা। কাগজের পত্রিকা যখন পড়া হতো সেটা নির্দিষ্ট কয়েকটি সংবাদের মধ্যে আমাদের যাতায়াত সীমাবদ্ধ ছিল, কিন্তু সেটা ঘটত বিস্তারিত আকারে। এই নতুন পরিসর যেন সংবাদের ভাগাড়। আমাদের সামনে একের পর এক সংবাদ আসতেই থাকে, আমরা গোগ্রাসে নিতে থাকি, কিন্তু কোনোটার সাথেই আমাদের বিস্তর মোলাকাত ঘটে না। এই জনপরিসর অস্থিরও বটে। এর নানা কিসিমের ঘাত-প্রতিঘাত ইতিমধ্যে দেখা যেতে শুরু করেছে। প্রযুক্তির বিস্তার ও নতুন জনপরিসরের গণতন্ত্রায়নের একটি নমুনা হিসেবে টিকটক নামক প্ল্যাটফর্মকে আমরা দেখতে পারি। এতে যে হারে সমাজের বাদ-পড়া শ্রেণির অংশগ্রহণ ঘটেছে, অন্য কোনো প্ল্যাটফর্মে তা ঘটেনি। এই প্ল্যাটফর্মে যে অজস্র ভিডিও-কন্টেন্ট নির্মিত হচ্ছে, তা কোনোভাবেই আমাদের প্রবল প্রভাবশালী 'মধ্যবিত্তীয়' রুচির অনুগামী নয়। এত কাল যাবৎ ভিডিও কন্টেন্ট নির্মাতা ছিল প্রধানত এই 'মধ্যবিত্তীয়' রুচি; 'সংস্কৃতি' বলে যা ঘোষিত হয়েছিল তার যাত্রা ছিল ওপর থেকে নিচের দিকে। ধরে নেয়া হয়েছিল নিম্নশ্রেণি বা বাদ-পড়া শ্রেণি হবে ভোক্তা মাত্র। মধ্যবিত্ত তৈরি করবে, নিম্নবিত্ত সেটা গ্রহণ করবে। 'ভোক্তা' শ্রেণি সে রুচি গ্রহণ করল কি না তা যেমন বিবেচনায় নেয়া হয়নি, তেমনই 'ভোক্তা' শ্রেণির নিজস্ব রুচির বড় ধরনের কোনো বহিঃপ্রকাশও সম্ভব ছিল না। ফলে, তাদের রুচি সম্পর্কে মধ্যবিত্ত ছিল পুরোপুরি বেখবর। কিন্তু হালজমানায় প্রযুক্তির প্রবল বিস্তারের ফলে এই একরৈখিক সম্পর্কে কিছুটা ফাটল ধরল। মানুষের বিচিত্র অংশগ্রহণ বেড়ে গেল। এমন কিছু ঘটতে লাগল যা আমাদের 'চিরচেনা' রূপের মধ্যে যেন আর আঁটানো গেল না। গ্রামের কোনো এক প্রান্তে বসেও যে কেউ ভিডিও নির্মাণ করতে পারছেন, এবং সেটা হাজার মাইল মানসিক দূরত্বের বাসিন্দা শহুরে মধ্যবিত্তকে দেখতে হচ্ছে। মধ্যবিত্তের রুচি ধাক্কা খাচ্ছে। সে এই পরিসরকে ভয় পাচ্ছে, ঘৃণার চোখে দেখছে। টিকটকারদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময়ে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ায় মধ্যবিত্তের ফতোয়ার মধ্যে এই ভয় ও বর্ণবাদ দুটোই ফুটে ওঠে।